

চাকরিপ্রার্থীদের দখলে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

নোট নিতে পারেন না।' তিনি বলেন, 'যারা বিসিএস দিচ্ছেন, ব্যাংকে পরীক্ষা দিচ্ছেন, তারাও আমাদের প্রাক্তন ছাত্র। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বলে এখানে পড়াশোনা করে স্বস্তি পান তারা। তবে হলের রিডিং রুমগুলো খালি থাকছে।'

১৯২১ সালের ১ জুলাই তৎকালীন ঢাকা কলেজের গ্রন্থাগার থেকে পাওয়া ১৭ হাজার বই নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের যাত্রা শুরু হয়। গত প্রায় এক শতাব্দীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেবর বেড়েছে কয়েকগুণ। ঢাবির প্রায় ৯২টি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে প্রায় ৩৫ হাজার ছাত্রছাত্রী এখন পড়াশোনা করছেন। তাদের বেশিরভাগই অধ্যয়ন করতে চান কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে এসে। তবে আসন সংকুলান হয় না তাদের। শিক্ষার্থীদের মাত্রাতিরিক্ত চাপ মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ, যদিও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের তিনতলা ভবনটির সম্প্রসারণ করার কোনো উদ্যোগ নেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের।

তাদের বই তাকেই থাকে : সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে গড়ায়াদের মধ্যে চাকরিপ্রার্থীই বেশি। স্নাতক শেষ করে তারা ব্যস্ত এমপি থ্রি সিরিজের বই মুখস্থ করতে। হাতে-বগলে-ব্যাগে করে বিভিন্ন চাকরি লাভের সহজ উপায় হিসেবে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত আকারের বই নিয়ে লাইব্রেরিতে আসেন তারা। দিনভর অধ্যয়ন শেষে চলে যান। শিক্ষার্থী যারা আসেন, তাদের অনেকের কাছে থাকে সুনির্দিষ্ট পাঠ্যবই। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে থাকা বইয়ের ব্যবহার তাই নেই বললেই চলে। সময় নেই তাদের আলমারিতে রাখা বইয়ের দিকে নজর দেওয়ার। শিক্ষকদের কাছ থেকেও নতুন রেফারেন্স বইয়ের পরামর্শ তারা পান না তেমন। তাই ধুলোর ঝুপ জমছে লাইব্রেরির তাকে রাখা বইয়ে। অথচ ইতিহাস বলে, এ গ্রন্থাগারই একসময় ব্যবহার করেছেন সত্যেন বোস, যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, কাজী মোতাহার হোসেন, আব্দুর রাজ্জাক, মুহাম্মদ হাসান দানি, মুনীর চৌধুরী প্রমুখ বিদ্বান। কয়েকজন শিক্ষার্থী জানালেন, শিক্ষকরাও গ্রন্থাগারে আসেন না খুব একটা। এলেও বই নবায়ন করে কিংবা নতুন বই নিয়ে চলে যান। এক কথায়, অনুসন্ধিৎসু হয়ে এ গ্রন্থাগার কেউ আর ব্যবহার করেন না বললেই চলে।

নতুন জার্নালের অন্তর্ভুক্তি কর্ম : ২০০৫ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ গ্রন্থাগারে যুক্ত করতে পারেনি নতুন কোনো বই ও জার্নাল। বই কেনার জন্য প্রতিবছর প্রায় কোটি টাকার ওপর বরাদ্দ থাকলেও তা বেশ অবহেলিত। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পুস্তক ও জার্নাল কেনার জন্য বাজেট ছিল এক কোটি ২০ লাখ টাকা। এ ছাড়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ছাড়াও লাইব্রেরির সার্বিক উন্নয়নের জন্য বাজেট রাখা হয় দুই কোটি তিন লাখ টাকা। কিন্তু এ বাজেটেরও সদ্যবহার না হওয়ায় গত কয়েক বছরে লাইব্রেরিতে খুব একটা পরিবর্তন আসেনি। প্রায় ১০ বছর ধরে এখানকার শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা সর্বশেষ সংস্করণের কোনো বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে পারছেন না। অবশ্য প্রিন্ট জার্নাল না বাড়লেও অনলাইন জার্নালের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেড়েছে। বর্তমানে এখানে প্রায় ছয় লাখ ৭৪ হাজার ৫৩৮টি বই ও সাময়িকী আছে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, যুগোপযোগী বই না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষার চাহিদা পরিপূর্ণভাবে মেটাতে পারছে না গ্রন্থাগারটি।

অবকাঠামোগত সুবিধা প্রকট : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো লাইনের শেষ নেই। ভর্তির লাইন, হলে আসনের লাইন, ডাইনিংয়ের লাইনের মতোই আরেকটা লাইন হলো গ্রন্থাগারে ঢোকানো লাইন। দেশের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার এক করুণ চিত্র ধরা পড়ে এ লাইন দেখলে। ভেতরেও পড়ালেখার উপযুক্ত পরিবেশ নেই বলে অভিযোগ করেন শিক্ষার্থীরা। তাদের মতে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে গ্রন্থাগারের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হয়নি। তাই দরকারি বইয়ের চাহিদাপত্র দিলেও 'নেই' বলে জানিয়ে দেন গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। বর্তমানে গ্রন্থাগারে আসনসংখ্যা এক হাজার ১০০টি। এসবের অনেক আসনই আবার ব্যবহারের অনুপযুক্ত। চাপাচাপি করে হলেও তাই দেড় হাজারের বেশি শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করতে পারেন না গ্রন্থাগারে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী প্রায় ৩৫ হাজার। এর মধ্যে কলা, সামাজিক ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের প্রায় ২০ হাজার শিক্ষার্থী এ গ্রন্থাগার ব্যবহার করে থাকেন। এত শিক্ষার্থীর জন্য এত স্বল্প আসন কল্পনাতেই শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, প্রতিদিন ভোর ৬টার দিকে ঘুম থেকে উঠেই লাইব্রেরিতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে হয়। কারণ সাড়ে ৭টার পর গেলে আর সিট পাওয়া যায় না। এই সামান্য সময়েই প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের সারি লাইব্রেরি থেকে ডাকসু ছাড়িয়ে যায়।

ফটোকপি সমস্যা : মেশিনের অপ্রতুলতায় ফটোকপি করতেও ভোগান্তিতে পড়তে হয় শিক্ষার্থীদের। দীর্ঘসময় পার করতে হয় বই কপি করতে। কপির জন্য বই দিলে প্রায়ই 'আগামীকাল আসবেন' বলে রেখে দেন কর্মচারীরা। গ্রন্থাগারের কর্মচারীদের অনেকেই অদক্ষ। অনেকেই আছেন এসএসসি অথবা তার নিচের শ্রেণির। এসব কারণে অনেকেই ঠিকভাবে বুঝতে না পেরে বই ডেলিভারিও দিতে পারেন না। ফলে প্রতিদিনই ফটোকপি সমস্যায় পড়তে হয় শিক্ষার্থীদের।

আরেক যন্ত্রণা শব্দ দূষণ : লাইব্রেরির পাশে বসেই প্রচুর শিক্ষার্থী আড্ডা দেন প্রতিদিন। মধুর ক্যান্টিনকেন্দ্রিক ছাত্র সংগঠনসমূহের মিছিল মিটিংয়ের উচ্চ আওয়াজ গ্রন্থাগারকেও স্পর্শ করে। আবার বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর সমাবেশের অন্যতম স্থান লাইব্রেরি চত্বর। এসব কারণে পড়ুয়াদের মনোযোগে প্রতিনিয়ত ছেদ পড়ে। এমনকি লাইব্রেরিতে আওয়াজ করে কথা বলা, গল্প করা, ফোনালাপ, চেয়ার টানাটানি ইত্যাদি নিষিদ্ধ থাকলেও এসবের নেই কোনো কার্যকারিতা। আবার গ্রন্থাগারে সবাই যে পড়তে আসেন, তাও কিন্তু নয়। অনেকেই দল বেঁধে লাইব্রেরিতে এসে পড়াশোনার বদলে গল্প শুরু করেন। কেউবা প্রাইভেট পড়ানোর কাজ সারেন এ গ্রন্থাগারে বসেই! আবার কাউকে আসন দখল করে রাখতে দেখা যায় অন্য কারও জন্য!

বাথরুমের দুর্গন্ধ : গ্রন্থাগারে ঢুকতেই প্রথম তলার বাথরুমের দরজা থেকে ভেতর পর্যন্ত কাদামাখা স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ যে-কাউকে অসুস্থ করে তোলে। সেই সঙ্গে রয়েছে টয়লেটের অসহনীয় দুর্গন্ধ। টয়লেটের সিলিভারসহ আশপাশে ছড়িয়ে থাকে ব্যবহৃত টিস্যু। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার টয়লেটগুলোরও একই অবস্থা। শিক্ষার্থীদের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উচিত আসন-সংকট নিরসনের পাশাপাশি পর্যাপ্তসংখ্যক শৌচাগারের ব্যবস্থা করা এবং এর সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য : উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ.আ.ম.স. আরেফিন সিদ্দিক সমকালকে বলেন, 'লাইব্রেরি তো শুধু ছাত্রছাত্রীদের জন্য নয়, শিক্ষকদেরও দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও প্রয়োজন। লাইব্রেরির সমস্যাগুলো সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বই সংরক্ষণ ও প্রাপ্তির তথ্য ইলেকট্রনিক ও ডিজিটালাইজ করা হয়েছে। বইপত্র প্রতিবছরই আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। লাইব্রেরিতে হাজার হাজার জার্নাল রয়েছে।' তিনি বলেন, 'নতুন বহুতল বিশিষ্ট একটি লাইব্রেরি করা খুবই প্রয়োজন। সেটি না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরিগুলো শিক্ষার্থীরা যথাযথভাবে ব্যবহার করলে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির ওপর চাপ কমবে।'

চাকরিপ্রার্থীদের দখলে লাইব্রেরি

■ সাক্ষির নেওয়াজ

২০ নভেম্বর রোববার বিকেলবেলা। ঘড়ির কাঁটায় ৫টা বাজে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির তৃতীয় তলায় নিবিষ্টমনে পড়ছিলেন জহিরুল ইসলাম জহির। বিসিএসের সুবিশাল গাইড বই তার সামনে খোলা। কাছে গিয়ে আলাপ করতে চাইলে সমকালের প্রতিবেদককে সঙ্গে নিয়ে লাইব্রেরির বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। জানালেন, তিনি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে এ বছর মাস্টার্স শেষ করেছেন। থাকতেন কবি জসীম উদ্দীন হলে। হল ছেড়ে বেশ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে এখন আজিমপুরের এক ফ্ল্যাটে থাকেন। পড়াশোনার পরিবেশ নেই সেখানে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে এসে পড়েন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের অনেকেই এসে এভাবে ব্যাংকের নিয়োগ পরীক্ষা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিয়োগ পরীক্ষাসহ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অধীনে বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার জন্য বিকেলে বা সন্ধ্যায় লাইব্রেরিকে ব্যবহার করে থাকেন। অথচ লাইব্রেরিতে এসে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের অনেকেই বসার স্থান পান না এখানে।

বিষয়টি স্বীকার করে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক

ড. আ.আ.ম.স. আরেফিন সিদ্দিক

সমকালকে বলেন, 'কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি যখন চালু হয়, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসংখ্যা ছিল দুই হাজারের মতো। বই ছিল আট হাজার। এখন শিক্ষার্থী ৩৫ হাজার। বইয়ের সংখ্যা লাখ ছাড়িয়েছে অনেক আগেই। সঙ্গত কারণেই উৎসাহী সব শিক্ষার্থী এসে বসতে বা পড়তে পারেন না।

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

● আগামীকাল শেষ পর্ব

